মহাশ্বেতা দেবীর : 'বান'

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক, যিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক ও শোষিত মানুষের জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। আদিবাসী, ভূমিহীন কৃষক, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ এবং রাষ্ট্র ও ক্ষমতাবান শ্রেণির দ্বারা নিপীড়িত মানুষের কথা তাঁর সাহিত্যের প্রধান বিষয়। 'বান' গল্পটিও তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গল্প, যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি সামাজিক অবহেলা, শোষণ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার নির্মম রূপ ফুটে উঠেছে।

'বান' গল্পের পটভূমি একটি নদীনির্ভর গ্রামীণ অঞ্চল। এখানকার মানুষ মূলত দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী। তাদের জীবন নদীর উপর নির্ভরশীল। বর্ষাকালে নদীতে জল বাড়ে—এটি তাদের কাছে নতুন নয়। কিন্তু গল্পে যে বন্যার কথা বলা হয়েছে, তা স্বাভাবিক নয়; এটি ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী।

মহাশ্বেতা দেবীর ভাত সমস্যা কেন্দ্রিক একটি উৎকৃষ্টতম গল্প হল 'বান'। গল্পটি ইং ১৯৬৮ সালে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে যাকে আশ্রয় করে কাহিনির বিস্তার ও পরিণতি তার নাম চিনিবাস। পিতৃহীন, সহায়-সম্বলহীন, রোজগারহীন পরিবারের অসহায় বালক এই চিনিবাস। যারা দুবেলা দুমুঠো গরম ভাত খেতে পায় না; পানা পুকুরের কুড়িয়ে আনা কচু, ঘেঁচু ও গুগলির শাঁস সেদ্ধ করেই যাদের সংসার চলে, তেমন একটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করছে এই চিনিবাস। তাই গল্প মধ্যে শ্রেণিহীন, বিত্তহীন, সহায়-সম্বলহীন চিনিবাসের গরম ভাত খাওয়ার স্পৃহা, লালসা ও চাহিদাকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। পরের বাড়ির গরম ভাত খাওয়ার আশায় সে হাপিত্যেশ করে থাকে- ক্ষুধা নিবৃত্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে নিজের অভিমত পোষণ করে। ক্ষুন্নি বৃত্তির তাগিদ মানুষের প্রবৃত্তিকে কীভাবে চালিত করে; ধর্ম সংস্কার, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা সবকিছুই যে পেটের জ্বালার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়- তারই মমন্তুদ এক চিত্র পরিবেশিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে।

খাদ্য সমস্যার ভিন্নতর রূপ তথা ভাত সমস্যার প্রতিফলনকে চিনিবাসের মনোভাবের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই গল্পের মূল বিষয়। গল্পের আলোচনায় দেখা যায়, ভাদ্রমাসের রান্নাপুজোর দিনে চিনিবাস তার মা রূপসী বাগদিনীকে রান্নাপুজোর কথা বলে- অন্তরে এই আশা নিয়ে, অন্তত এই একটি দিনে পুজোর নাম করে হলেও ভাত খাওয়াটা ভালোভাবে হবে। কিন্তু রূপসী জানায় যে, কাটোয়ার জ্যেঠা মারা যাওয়াতে এবছর রান্নাপুজো হবে না। অবশ্য পুজোর যোগাড় কীভাবে হবে সে নিয়ে চিনিবাসের কোনো মাথাব্যাথা নেই। কারণ, সে জানে প্রত্যহ ভাতের যোগান ধরতে না পারলেও পুজোর দিনটিতে ঠিকই কোনো না কোনো উপায়ে সব আয়োজন হয়ে যায়, বরাবর তা-ই করে এসেছে রূপসী। তাই চিনিবাসের উদরপূর্তিটা সেদিন তৃপ্তি করেই সাঙ্গ হয়। কিন্তু এবারে তাদের গ্যাতির মৃত্যুতে বাড়িতে রান্নাপুজোতে বাধা পড়ায় মনক্ষুণ্ন হয় চিনিবাসের। তবু সে হাল ছাড়ে না, গ্রামের বড়ো বাড়িতে তথা আচার্য বাড়িতে তো

হবেই- এই ভেবে মন খারাপ নিয়েও সে সেখানে ছুটে যায় পুজোর শেষে পেট ভরে ভাত খাওয়ার আশায়। তাই সে আচার্য বাড়িতে গিয়ে আচার্য গৃহিণীর রান্নাপুজোর জন্য মনসা গাছের যোগান দিতে চায়। আচার্যদের সচ্ছল অবস্থা, এখনও ওই বাড়িতে শতশত লোককে দু-বেলা পাত পেড়ে খেতে দেওয়া হয়। চিনিবাস বড়ো আচার্য গৃহিণীর কাছে গিয়ে মনসা গাছ আনার কথা জানালে আচার্যানী রূপসী বাগদিনীর ছেলে চিনিবাসকে দেখে রেগে যান- তাঁর সর্ব অঙ্গ জ্বলে যায়। মনে মনে তাকে 'অপয়া' বলে গালিগালাজ করেন। কিন্তু এই গালিগালাজে কর্ণপাত করে না সে, বরং ক্ষুধার্ত চিনিবাস উঠোন থেকে দাঁড়িয়ে গরম ভাতের গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে যা লেখিকার ভাষায় রূপ পায় এভাবে–

"রান্নাঘরের দোর দিয়ে গরম ভাতের গন্ধ আসছে।... কতদিন চিনিবাস গরমভাত খায়নি। কতদিন বামুন বাড়িতেও খায়নি।"

তাই সুতীব্র আশা নিয়ে অনড় অচল ভাবে দাঁড়িয়েই থাকে সে। কিন্তু তার এই অপ্রত্যাশিত আগমন বড়ো আচার্য গৃহিণীর যেমন কাঙ্ক্ষিত নয়, তেমনই ছোট আচার্যানীও তাকে সহ্য করতে পারেন না। বড়ো গৃহিণীর ক্ষোভের কারণ হল চিনিবাসের মায়ের রূপ আর পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা- যদিও রূপসী বাগদিনীর মতো গরিব মানুষ এই 'পূর্বস্থলী'তে কেউ নেই। আর ছোট আচার্যানীর মনে ভয়, ক্ষুধার্ত চিনিবাসের কু–নজর লেগে বুঝি তাঁর কোলের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই শিশু সন্তানের ওপর থেকে চিনিবাসের কু–দৃষ্টি এড়ানোর জন্য চিনিবাসকে মুড়ি দিয়ে বিদায় করেন। তবু মিটল না তার ক্ষুধার তাড়না–

"চিনিবাসের চোখ দুটো যেন সর্বদা খাই খাই। এত খিদে ওর কোথেকে আসে কে জানে।"

এই দুর্নিবার ক্ষুধা চিনিবাসের একার নয়- একটি পিতৃহীন, নিরন্ন পরিবারের অভাগা সন্তানের প্রতিনিধি হয়ে সে যেন চোখে মুখে প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছে তার অপ্রাপ্তিজনিত ক্ষুধার এক নিদারুণ মর্মজ্বালাকে।

এদিকে মুড়ি নিয়ে ছুটে চলে আসে চিনিবাস খাল ধারে তার দিদিমার কাছে। তাদের পরিবার বলতে ওই তিনজনই সদস্য– সে, তার মা রূপসী ও দিদা। তার দিদা তখন জলে ভরা খালে পেঁড়ি-গুগলি খোঁজায় ব্যস্ত, তা–ই সেদ্ধ করে খেতে হবে তো। চিনিবাসও দিদিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গুগলি তুলল, যতক্ষণ না হাত পা জলে ভিজে অসাড় হয়, তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে দিদার কাছে বানের গল্প শুনতে চায়–যে বানের জলে, যে প্লাবনের জোয়ারে মানুষ–গোরু–শেয়াল–কুকুর সব ভেসে গিয়েছিল। এই বানের প্রকোপের কথা গল্পের আদলে শুনতে থাকে সে– সেই গল্প দিদার কাছ থেকে শুনতে শুনতে একটা জায়গা খুব ভালো লাগে তার। তা হল, বানের সময়ে মানুষেরা সব দেবতা হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে প্রাণ রক্ষার তাগিদে সকলে মিলিত হতে বাধ্য হয়েছিল। বামুনেরা ধামা ধামা চিড়ে–মুড়ি–বাতাসা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। যাদের রান্নার জায়গা ছিল তাদের চাল–ডালও দিয়েছিলেন তাঁরা। আচার্য বাড়িতে সুন্দরী যুবতী রূপসী বাগদী ও তার মা–ও আশ্রয় পেয়েছিল, তাদের রাঙাবস্ত্র ও খাবারের যোগান ধরেছিলেন বড়ো আচার্য মহাশয়, এমনকি তাদের থাকার জন্য নতুন গোয়ালঘরে জায়গা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া মাঁচা থেকে

শুকনোকাঠ–চাল–ডাল–তেল–নুন–সিধে–আনাজপাতি–মাছ দিয়েও তাদের সাহায্য করেছিলেন। বন্যার জল সরে গেলেও চিনিবাসের মা ও দিদিমা অনেকদিন আচার্যবাড়িতে থেকে যায়। এই অংশগুলি বারবার শুনতে চিনিবাস খুব পছন্দ করে। অবশেষে নিজের মাহিন্দারের সঙ্গে রূপসীর বিয়ে দিলেন বড়ো আচার্যীকর্তা। চিনিবাসের জন্ম হল, কিন্তু জ্বরে ভুগে মারা গেল তার পিতা। সেই থেকে চিনিবাসের মা-দিদিমা তাকে দু-বেলা পেটপুড়ে দু-মুঠো খেতে দিতে অসমর্থ হয়। তাই খাবারের আশায় সর্বদা বুক বেঁধে এবং স্বপ্নময় বানের অলীক কল্পনা নিয়ে বসে থাকে চিনিবাস।

ইতিমধ্যে দিদিমার কাছে গল্প শোনার মাঝখানেই শোনা গেল ঢাকের বোল- গ্রামে গ্রামে ঢোলমোহর দিয়ে আচার্য বাড়িতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আগমনবার্তা তথা গোরাবানের কথা ঘোষণা করে। সেই বান উপলক্ষে আচার্য বাড়িতে কীর্তন, ঠাকুরসেব, প্রসাদ বিতরণ আর গৌরাঙ্গ দর্শনের জন্য গ্রামবাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। চিনিবাস ছুটে গিয়ে এই গোরাবানের খবর মা রূপসীকে জানায় এই আশায় যে, এই বানও গঙ্গার জলপ্লাবিত বানের মতোই হবে, যেখানে সবাই যাবে, যেখানে দিবাকর চক্রবর্তীর মতো বামুন, চিনিবাসের মতো বাগদী সবাই একসঙ্গে বসে খেতে পাবে। বুকভরা আশা নিয়ে চিনিবাস তার মা-কে জানায়–

"চিড়ে মুড়ি না রে আয়ী! ভাত হবে, পরমান্ন, ঘি সম্বরা ডাল, আর নারকেল ছাঁচিকুমড়োর বেল্তুন।"

এই অন্নময় স্বপ্নে বিভোর হয়ে চিনিবাস ডুবে থাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত গৌরাঙ্গ না আসায় বিকেলে মাহিন্দাররা ভক্তদের মুড়ি বাতাসা দিয়ে বিদায় দেন। লেখিকা এপ্রসঙ্গে গল্প মধ্যে বলেছেন–

"শুধু তো গৌরাঙ্গ দর্শন নয়, পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা।"

অর্থাৎ পেটভরে খেতে পাবে বলেই মা-ছেলে, বুড়ো-বুড়ি, কানা-খোঁড়া, অনাথ-আতুর সবাই এসে বসেছিল। তাদেরই মধ্যে অন্যতম ছিল চিনিবাস–গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু গৌরাঙ্গ এলেন না– চিনিবাসের স্বপ্নভঙ্গ হল, আশাহত হয়ে তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। ক্ষুধার্ত দর্শনার্থীদের অভিপ্রায় ছিল খেতে পাবে– কিন্তু তা না হওয়ায় তারা বলল–

"তা মুড়ি বাতাসা দিচ্ছে কেন গো? পেসাদ পাব বলেছিলে না?....কিন্তুক আমরা খাব বলে আশা করে এসিছি গো।"

অতীতে গঙ্গার কোনো এক বান তার ভয়ঙ্কর প্রতাপে অন্তত সাময়িক ভাবে হলেও জাত-পাতের বিভাজন দূরীভূত করে দিয়ে নিরন্ন, অনাহার ক্লিষ্ট, পদপিষ্ঠ, অন্ত্যজ, দরিদ্র নিপীড়িত মানুষগুলিকে দুটো অন্নের সংস্থান করে দিয়েছিল। উঁচু জাতের ক্ষমতাবান প্রতিভূরা বন্যার ধাক্কায় বাধ্য হয়ে ছিল প্রান্তবর্ণীয় হতভাগ্য, বিত্তহীন মানুষগুলিকে খাদ্য পরিবেশন করতে। তাই এবারও তাদের আশা ছিল অনুরূপ। লেখিকার ভাষায় সত্যি যেন তাদের কাছে-

"ঠাকুরদর্শনের চেয়ে খাওয়াটাই বড়ো।"

এই ভাত খাওয়ার আশা নিয়ে তো চিনিবাসও বসে ছিল, কিন্তু তার স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় সে তার মা রূপসীকে রান্নাপুজো না করার জন্য ক্ষুব্ধ চিত্তে, অভিমান ও অভিযোগের সুরে, রাগ করে জানায়–

"কেন আমার পেট ভরে ভাত খেতে সাধ যায় না?"

এই অংশে লেখিকা ক্ষুধার্ত চির আকাঙ্ক্ষিত চিনিবাসের অসহায়তাকে জীবন্ত ভাষায় মূর্ত করে তুলেছেন।

বন্যা বা বানের প্রকোপ স্বাভাবিক ভাবে ও সাধারণত ভয়াবহই হয়- তা থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ মাত্রই তটস্থ থাকে। বানের কবলগ্রস্ত, দুর্দশাভোগী মানুষ কোনোদিনই প্রত্যাশা করে না যে বন্যা আসুক বা একটি স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে তচনচ করে দিক, একটি সুন্দর জীবনকে ব্যাহত করে উদ্বাস্তু ও ছিন্নমূল করে দিক মানুষকে। তাই বানের আগমন আমাদের কাছে প্রত্যাশার হতে পারে না কোনোদিনই অথচ বন্যা ভয়াবহ হওয়া সত্বেও চিনিবাসের মতো মানুষের কাছে তা ভাত সমস্যা থেকেও অনেক বেশি ফলপ্রসূ ও শান্তিদায়ক। কারণ, তাদের সমাজে একদিন এই বানই বহন করে এনেছিল ক্ষুধা নিবৃত্তির যথেষ্ট উপকরণ। উদরপূর্তির এরথেকে ভালো সুযোগ তাদের জীবনে আর আসেনি ইতিপূর্বে। গৌরাঙ্গের নামে সমাজে সেদিন যে বান এসেছিল তা চিনিবাসের খিদে মেটাতে পারেনি। তাই বানরূপ চৈতন্য রেনেসাঁসের মাহাত্ম্য ওই শ্রেণির অভুক্ত মানুষের বোঝার কথাও না বা তাদের কাছে তা ততো বেশি আবেদন নিয়ে আসেও না- যতোটা আনতে পেরেছিল সর্বনাশী বন্যার ভয়াবহতা। তাই চিনিবাস মনে মনে জলপ্লাবিত সত্যিকারের বানকেই আজও আকাঙ্ক্ষা করে, সেই কামনাতেই সে গল্পের পরিণতিতে বলতে পারে–

"গৌরাঙ্গের বানের চে সে বান ভাল রে আয়ী। তেমন বান আর আসে না? সেই যে যেমন বানে চিড়ে মুড়ি চাল দেয় এত? দুস্থ ঘুচে যায়?"

একটি পরিবারে খাদ্য সমস্যা কতটা প্রকট হলে, নিরন্ন থাকার যন্ত্রণা কতটা বেদনাদায়ক হলে, খাদ্যের অভাব কতটা ভয়াবহতার রূপ পেলে, ভাত খেতে না পারার মর্মজ্বালা কতটা দুর্বিষহ হলে, ক্ষুধার্তের আকুতি কতটা মর্মান্তিক হলে মানুষ এহেন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে পারে তা ভাবলেই শিহরণ জাগে মনে। ভয়ানক বন্যাও ভাত সমস্যার তীব্রতার কাছে তুচ্ছ– নিষ্প্রভ হয়ে যায় বলে প্লাবনও তাদের কাছে তখন প্রার্থিত বলেই মনে হয়।

এই গল্পে অবশ্যই চিনিবাসের মতো প্রান্তিক বাগদি মানুষের সামাজিক অবস্থানটিও আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই সামাজিক পরিকাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই চিনিবাস খাদ্যের জন্য সারাদিন অপেক্ষারত থেকেও ভাত পায় না। ফলে ক্ষুধা কাতর চিনিবাসের মানসিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটে এই গল্পের বয়ন শিল্পের মধ্যে। 'বান' শব্দটি যে ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে খাদ্য সমস্যাকেও অভিব্যক্ত করতে পারে– সেই কৌশল জানা ছিল মহাশ্বেতা দেবীর। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার ভয়াবহতা ও বীভৎসতা, তার অসহায় ও কুৎসিত রূপের অন্তরালেও যে খাদ্য সমস্যা জর্জর মানুষগুলি প্রাণ পেতে পারে; জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখে এই বন্যাকেও যে অঙ্গীকার করে নিতে আগ্রহী এক

শ্রেণির নিরন্ন মানুষ– সেই শুভ সূচক অর্থবহ ইঙ্গিতটিও যেন বহন করে চলেছে মহাশ্বেতার ব্যবহৃত 'বান'শব্দটি। যে আর্তনাদ বন্যা ত্রাসিত মানুষের মধ্যে আশা করা যায় তার থেকে অনেক বেশি কারুণ্যের সুর বেজে উঠেছে খাদ্য সমস্যাভোগী মানুষের মর্ম যন্ত্রণার মধ্যে। তাই 'বান' শব্দটি তার ভয়াবহতা কাটিয়ে, একটি নির্দিষ্ট গন্ডি অতিক্রম করে একটি বিশেষ শ্রেণির কাছে কীভাবে স্বমহিমায় তার আবিলতা পরিত্যাগ করে খাদ্য পূরণের অঙ্গীকার হয়ে ওঠে- মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য গল্পে সে কথাই নতুন দ্যোতনায় প্রকাশ করেছেন। জীবনকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চয় করেছিলেন বলেই তিনি মানুষের প্রাথমিক সমস্যার নবরূপায়ণ ঘটালেন নতুন ভাবনায়, অনবদ্য ভঙ্গিতে– আর আমাদেরও তাঁর ভাবনার সমভাগী হওয়ার সুযোগ করে দিলেন এই 'বান' গল্পটির মাধ্যমে।

সবশেষে বলা যায়, 'বান' গল্পটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সামাজিক শোষণ ও বৈষম্যের এক শক্তিশালী দলিল। এই গল্প আমাদের সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে সামনে আনে এবং পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। আজও এই গল্প সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ দুর্যোগের সময় দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহাশ্বেতা দেবীর 'বান' তাই শুধু একটি গল্প নয়, একটি প্রতিবাদী সাহিত্যকর্ম।